সংকলন - ২ । এপ্রিল ২০১৩

নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা নির্ধারণ একটি সমস্যা হিসাবেই দেখল আই-আই-এম সমীক্ষা

রাজ্যের স্কুল শিক্ষার উন্নতিতে প্রশাসনিক সংস্কার জরুরী। Indian Institute of Management (IIM) -এর কলকাতা শাখা এই মত ব্যক্ত করেছে তাদের একটি রিপোর্টে। দেরীতে হলেও ২০১০ সালে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্যের স্কুল শিক্ষার বিষয়ে। সরকার IIM-এর কলকাতা শাখাকে রাজ্যের প্রি-স্কুল থেকে হাইস্কুল শিক্ষার হাল হকিকৎ জানতে এক সমীক্ষার ভার দেয়। সমীক্ষান্তে Study Report on Restructuring of School Education System in West Bengal এই শিরোনামে IIM একটি মুল্যবান রিপোর্ট প্রকাশ করে। সমীক্ষাটি খুবই সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, ২০১০ সালের এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক Right to Education Act 2009 ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর রাজ্যে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উচ্চ স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় বদল আসা স্বাভাবিক ছিল। মূলত সেটা বুঝতেই এই সমীক্ষা। তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩৩৫টি স্কুল, ৩৪৩৭টি পরিবার, ৯৬টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, ৮টি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও ১২৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়।

সমীক্ষায় শিক্ষকদের দায়িত্ব নির্ধারণ, শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকশিক্ষণ, স্কুল পরিদর্শন এবং মিড-ডে-মিলের অনুপযোগী প্রশাসনের মত বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, শিক্ষকরা নিয়মিত নির্ধারিত পাঁচ ঘণ্টা সময় কাজ করেন না। তাই এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষকরা স্কুলের জন্য প্রত্যেক কাজের দিনের নির্ধারিত সময় ব্যয় করবেন এবং নির্ধারিত ক্লাস নেবেন। বছরের ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ছাত্রদের ইউনিট টেস্টও নেওয়া হয় না। দূরে বাড়ি হওয়ায় অনেকেই ছুটির আগেই বেরিয়ে পড়েন। রিপোর্টে একথাও বলা হয়েছে যে, শিক্ষকদের সেনসাসে নিয়োগের ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়। সংশিষ্ট অন্য বিষয়গুলি হল, স্কুল পরিদর্শন, পার্শ্বশিক্ষক, শিক্ষাবন্ধু ও প্রাইভেট টিউশন।

প্রাইভেট টিউশনের বিষয়টি সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রামের তুলনায় শহরেই প্রাইভেট টিউশনের আধিক্য বেশি। প্রাইভেট টিউশনের কারণ হিসাবে রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্কুলে পড়াশোনার মান খারাপের জন্যই যে অভিভাবকরা সন্তানদের প্রাইভেট টিউটরের কাছে পাঠায় তা নয়, পাঠায় ভালো রেজাল্ট ও পড়াশোনায় গাইডেন্সের জন্য।

■■

জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো: এক ঝলক

সংশোধিত জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (NCF- National Curriculum Framework) শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “সভ্যতা ও অগ্রগতি” লেখাটি থেকে নেওয়া উদ্ধৃতি দিয়ে, যেখানে কবি আমাদের মনে করাচ্ছেন যে “সৃষ্টিশীলতার আনন্দ” এবং “অনাবিল আনন্দ” ছোটবেলার দুটো প্রধান শব্দ যা বড়রা ভাবতে না পেরে অপব্যবহার করে। শুরুর অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে স্বাধীনতার সময় থেকে যে পাঠ্যসূচী পরিমার্জনের উদ্যোগ শুরু হয়েছে সেই বিষয়ে। জাতীয় শিক্ষা নীতিই (১৯৮৬), (NPE- National Policy on Education 1986), জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামোর প্রস্তাব দেয়,যার ফলস্বরূপ শিক্ষার একটা জাতীয় পদ্ধতি তৈরী হয়। প্রস্তাবিত হয় মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি যা জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে সংবিধানে স্থান পায়। প্রাসঙ্গিকতা, নমনীয়তা এবং মান এই লক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়ে কাজের পরিকল্পনা বিশদে রচিত হয়। প্রসঙ্গত,জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো সংশোধনের কাজটি শুরুর সিদ্ধান্ত হয় NCERT-র কার্যকরী কমিটির সভায় ২০০৪ সালে।

বর্তমান NCF পাঠ্যক্রমের উন্নতিকল্পে পাঁচটি সহায়ক নীতির কথা বলেছে। সেগুলি হল-

১। জ্ঞানকে স্কুলের বাইরে জীবনের সাথে মেলানো

২। উক্ত শিক্ষা যেন মুখস্থ করার থেকে দূরে থাকে তা সুনিশ্চিত করা

..... শেষাংশ ২-এর পাতায়

ফেলুদার মন জয় করল গ্রামের বাচ্চারা

গত ৫ই এপ্রিল, ২০১৩ কোচবিহার জেলার দিনহাটা ১নং বকের ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার খারিজা বালাডাঙ্গা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ও গ্রামের একঝাঁক শিশু উপস্থিত গণ্যমান্য বহু মানুষের মন জয় করে নিল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্য সচেতনতা নাটক "মুক্তির উপায়" পরিবেশন করে। ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এবং দেওয়ানহাট জনকল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কৃতিচর্চার এই উদ্যোগকে প্রশংসা ও সাধুবাদ জানিয়ে এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন আমাদের প্রিয় চরিত্র ফেলুদা তথা চলচ্চিত্র ও নাট্যজগতের খ্যাতনামা অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী।

পুঁথির ভারে ভারাক্রান্ত না হয়ে পড়াশোনার ফাঁকে শিশুদের আনন্দ ও মনের বিকাশ ঘটাতে সংস্কৃতি-চর্চার এই কর্মকাণ্ডে শিশু তথা উদ্যোক্তাদের প্রেরণা যোগাতে কোচবিহার জেলার এই প্রত্যন্ত গ্রামে ফাঁক পেলেই তিনি আবার আসবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক, অভিনেতা ও শিশুনাট্য নির্দেশক, শঙ্কর দত্তগুপ্তের আন্তরিক তত্ত্বাবধানে শিশুরা প্রতি শনিবার নাটকের অনুশীলন ও সংসদ এলাকায় নাটকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রচারও করে চলেছে। সব্যসাচী চক্রবর্তী ছাড়াও এই নাটক দেখতে ও তাদের উৎসাহ দিতে হাজির ছিলেন ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত সহায়ক এবং কোচবিহার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান স্নেহাশিষ চৌধুরী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী বিমান মণ্ডল।

ইতিপূর্বে এই ধরণের আর একটি উদ্যোগ জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি বকের মধু টি এস্টেট হাইস্কুলের কিশোর-কিশোরীরা করে দেখিয়েছে। স্কুল ছুটির পর সপ্তাহে একদিন ১৭ জন কিশোর-কিশোরী নাটকের অনুশীলন করে এবং স্বাস্থ্যই সম্পদ এই সত্যকে সামনে রেখে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নাটক “গাঁয়ের কথা” ইতি মধ্যেই চা-বাগান শ্রমিক বস্তির মানুষের মন জয় করেছে। পাড়ায় পাড়ায় এই নাটক পরিবেশিত হয়েছে। হাতে কলমে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার পথ খুঁজে পেয়েছে অপরিচ্ছন্ন, ঘিঞ্জি পরিবেশে থাকতে অভ্যস্থ বস্তির মানুষ।

সাতালী গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এবং নর্থবেঙ্গল ধুমকুড়িয়া অ্যাকাডেমি ট্রাস্টের সহযোগিতায় পড়াশুনার ফাঁকে সংস্কৃতিচর্চার এই উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ, স্কুল পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। নাটকের মাধ্যমে প্রচার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়গুলি সম্পর্কে আগের তুলনায় সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও শিক্ষক মহাশয় উভয়ই এই উদ্যোগ যাতে না থেমে থাকে, তার জন্য আন্তরিক প্রয়াস চালাবেন বলে জানিয়েছেন।

■■

উইলিয়াম অ্যাডাম্‌স্‌-এর চোখে ঊনবিংশ শতকের বাংলার শিক্ষাচিত্র

১৮১৮ সালে স্কটল্যান্ডবাসী উইলিয়াম অ্যাডাম্‌স্‌ (১৭৯৬-১৮৮১) ভারতে তথা কোলকাতার কাছে শ্রীরামপুরে আসেন একজন ব্যাপটিস্ট মিশনারি হিসাবে। সেখানেই তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শেখেন। অ্যাডাম্‌স্‌ রোজগারের পথ হিসাবে সরকারি কাজে যোগ দেন। ১৮৩৫ সালে বাংলার তৎকালীন গভর্নর উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর সরকারের নির্দেশে বাংলা ও বিহারের কিছু অংশে শিক্ষা নিয়ে সমীক্ষা করেন। EDUCATION IN BENGAL AND BEHAR এই শিরোনামে তিনটি পর্যায়ে সমীক্ষা রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রিপোর্টটি এক অবিস্মরণীয় দলিল। ১৮৩৮সালে শেষ রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। বর্তমান নিবন্ধের সমস্ত তথ্য ৩য় রিপোর্টটি থেকে সংকলিত। আমাদের আলোচনা আমরা সীমাবদ্ধ রাখব বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলা, যথা - মুর্শিদাবাদ,বীরভূম ও বর্ধমান-এর মধ্যে। মনে রাখতে হবে জেলাগুলির সে সময়কার সব থানায় সমীক্ষার কাজ হয় নি।

মুর্শিদাবাদ- এই জেলায় সেই সময় ৩৭টি থানার মধ্যে ২০টি থানায় সমীক্ষা হয়ে ছিল।এই থানাগুলোর আওতাধীন এলাকায় তিনি ৬টি ভাষার মোট ১১২টি এবং একটি মেয়েদের স্কুলের সন্ধান পান। বেশিরভাগ স্কুল ছিল বাংলা ভাষার,সব থানা মিলিয়ে ৬২টি। অন্যান্য ভাষার স্কুলগুলির মধ্যে ছিল - হিন্দি ৫টি, সংস্কৃত ২৪টি, পারসি ১৭টি, আরবী ২টি ও ইংরাজী ২টি। ৩টি থানা এলাকায় হিন্দি স্কুলগুলি গড়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে অ্যাডামস্‌ জানিয়েছেন যে, এসব এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের যেসব হিন্দিভাষি হিন্দুরা সন্তান - সন্ততি নিয়ে বসবাস করছেন তাদের প্রয়োজনে ও উদ্যোগে এগুলি গড়ে ওঠে। সংস্কৃত, পারসি, আরবী ও ইংরাজী ভাষার স্কুল গড়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে অ্যাডাম্‌স্‌-এর কোনও মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

শিক্ষকদের সম্বন্ধে তাঁর

..... শেষাংশ ৬-এর পাতায়

m¤úv`Kxq

শিক্ষার বাজারের বেড়াজালে সংকটে শিক্ষার অধিকার আইন

বিশ্বজুড়েই শিক্ষা এখন বাজারের পণ্য, পণ্য ভারতেও। ২০০৮ সালের হিসাব অনুসারে ভারতের বে-সরকারি শিক্ষা-বাজারের মূল্যমান ছিল ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, অনুমান করা হয়েছিল ২০১২ সালে এই মূল্যমান বেড়ে দাঁড়াবে ৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ভারতীয় মুদ্রায় পরিমাণটা অতি বিশাল। সাম্প্রতিক তথ্য আমাদের হাতে নেই, তবে ভারতের অর্থমন্ত্রীর সংসদে পেশ করা সাম্প্রতিক আর্থিক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে ভারতের গ্রামাঞ্চলে শিশুদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করার প্রবণতা বাড়ছে। শহরে তো বেসরকারি স্কুল অনেক আগেই ছেয়ে গেছে, সরকারি মান্যতাও পেয়েছে। উক্ত সমীক্ষায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উলেখ করা হয়েছে স্কুলে (সরকারি) নথিভুক্তি বাড়লেও, পঠন-পাঠনের মান কমেছে।

এরকম একটি পরিস্থিতিতে দেশে ঘোষিত হয়েছে শিক্ষা অধিকার আইন। এ আইনে শিক্ষা যেমন বিনি পয়সার, তেমন আবশ্যিক, যদিও কেবলমাত্র ছয় থেকে চোদ্দ বছরের শিশুদের জন্য। কিন্তু দেশে স্কুল শিক্ষার যা হাল হয়ে রয়েছে তাতে এই আইন যথাযথ রূপায়ণ বেশ কঠিন। এই আইন কেন্দ্রীয় সরকারের হলেও তাকে কার্যকর করতে হয় রাজ্য সরকারগুলিকেই। আর এটা মাথায় রেখেই পরিস্থিতি বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১০ সালে কলকাতার ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টকে একটি সমীক্ষার দায়িত্ব দেয়। সংস্থাটি বছরখানেক সময়ের মধ্যেই একটি চমকপ্রদ রিপোর্ট পেশ করে। সাধারণ মানুষের প্রায় অগোচরে থাকা রিপোর্টটি সম্পর্কে আমরা এবারের সংকলনে আলোকপাত করেছি। রিপোর্টটিতে যেসব সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে তার প্রথমেই আছে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা। শিক্ষকরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্কুলে থাকেন না, নিয়মমাফিক ক্লাস নেন না, স্কুলে নিয়মিত ইউনিট টেস্ট হয়না ইত্যাদি। প্রসঙ্গত বর্তমান সংকলনেই ব্রিটিশ শাসনকালে উইলিয়ম অ্যাডাম্স্-এর যে সমীক্ষা রিপোর্টটি আমরা প্রকাশ করেছি তাতে কিন্তু দেখা গেছে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পূর্ণ বিপরীত। মাহিনা না নিয়েই তাঁরা ছাত্র পড়াতেন, আর শিক্ষকদের উদ্যোগেই গড়ে ওঠা স্কুলগুলি চালু রাখার জন্য ছাত্ররা গান গেয়ে পথে পথে অর্থসংগ্রহ করত। শিক্ষা তখন প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠেনি।

ম্যানেজমেন্ট সংস্থার রিপোর্টে আরো যে সব সমস্যার উলেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হল স্কুল পরিদর্শকের ভূমিকা। এক্ষেত্রে অবশ্য দায়বদ্ধতার প্রশ্ন তোলা হয়নি, চিহ্নিত করা হয়েছে সংখ্যাল্পতার দিকটি। মিড-ডে-মিল নিয়ে প্রশংসাসূচক ধ্বনিই উচ্চারিত হয়েছে রিপোর্টে। স্কুল পরিচালন কমিটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, সদস্যরা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর বেশি সময় ব্যয় করেন না। রিপোর্টের একটি উলেখযোগ্য তথ্য হল এমটিএ যেখানে সচল, সেখানে পড়াশোনার মানও ভাল। প্রাইভেট টিউশন সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরে এর প্রকোপ বেশি। প্রসঙ্গত, শিক্ষা অধিকার আইনে প্রাইভেট টিউশন নিষিদ্ধ।

যেসব সুপারিশ করা হয়েছে, তাতে জানানো হয়েছে রাজ্যে ১৫৫৭ টি প্রাথমিক স্কুল ও ১৪৯৩৪ টি উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের ঘাটতি আছে। উচ্চ প্রাথমিকে সংখ্যাটা যথেষ্ট, শিক্ষা অধিকার আইনের নির্দেশ অনুযায়ী ১৯১১টি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রকে উচ্চ প্রাথমিকে উন্নীত করলেও ঘাটতি পরিমাণ বিশাল। শিক্ষা অধিকার আইনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে কোন জনপদের ১ কিলোমিটারের মধ্যে স্কুল থাকতে হবে। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা গেছে, রাজ্যে ১৬টি জেলায় এমন অনেক জনপদ আছে যেখানে ১ কিলোমিটারের মধ্যে কোন স্কুল বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র নেই। এই হিসাব থেকেই রিপোর্টে ১৫৫৭টি নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলগুলিকেই উচ্চ প্রাথমিকে উন্নীত করে ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে। রিপোর্টে একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল, স্কুলে গ্রামের শিশুদের (০-১৪) একটি রেজিস্ট্রার রাখা। এতে স্কুলছুট ধরতে সুবিধা হবে। শুধু তাই নয় শিশুবিবাহ, পাচার ইত্যাদির উপর নজর রাখতেও সুবিধা হবে।

শিক্ষা অধিকার আইন এরাজ্যে ইতিপূর্বে চালু হয়ে গেছে। সরকার আইন অনুসারে কাজ করছেন এমনটা আশা করা যায়। সরকার ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সুপারিশগুলি মাথায় রেখে কাজ করবেন এমনটা আশা করা যায়। তবে শিক্ষক সমাজের কাছে আমাদের আবেদন তাঁদের দায়বদ্ধতা যে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে তা মেরামত করতে হবে তাঁদেরকেই।

পঞ্চায়েত এবং শিক্ষা

সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী সমগ্র দেশে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এর লক্ষ্য গ্রাম, বক এবং জেলা স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে মানুষকে তাদের যৌথ স্বার্থের জন্য চিন্তা করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম করে তোলা, উন্নয়নে মানুষের আরও বেশী অংশগ্রহণ, রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়নে আরও কার্যকরী প্রয়োগকে নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়-এর আরও কার্যকরী প্রয়োগের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ।

> ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী ২৯টি বিষয়কে চিহ্নিত করে পঞ্চায়েতের দায়িত্বে দিয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, লাইব্রেরী, প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক (ভোকেশানাল) শিক্ষা।

৭৩তম সংবিধান সংশোধনী ২৯টি বিষয়কে চিহ্নিত করে পঞ্চায়েতের উপর দায়িত্ব দিয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, লাইব্রেরী, প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক (ভোকেশানাল) শিক্ষা। সমস্ত রাজ্য সরকার তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েত আইন তৈরি করে কাজ করে যাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং উন্নয়নের বিষয়ে সংবিধানের নির্দেশ মান্য করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ NCF ২০০৫

প্রথম পাতার পর .....

জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো

৩। পাঠ্যক্রম যেন এতটাই সমৃদ্ধ হয় তা যেন পাঠ্য বইকে অতিক্রম করতে পারে

৪। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সরল করে তাকে স্কুল জীবনের সাথে মেলানো

৫। সংশিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ এই দেশের গণতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে থেকেই সমাজের অবহেলিতদের অস্তিত্বের বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষাদান করবে

শিশুরা যাতে একটা সামগ্রিক জ্ঞানের স্বাদ এবং জানার আনন্দ অনুভব করতে পারে সেই জন্য বিষয়ের গণ্ডীকে শিথিল করতে NCF প্রস্তাব দিয়েছে। এর সাথে সেইসব পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য বস্তু যা আঞ্চলিক জ্ঞান ও প্রচলিত দক্ষতাকে অন্তর্ভুক্ত করবে সেগুলি গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে। এছাড়া স্কুলে একটি উদ্দীপনাময় পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যা শিশুটির বাড়ী এবং এলাকার পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণ। ভাষার ক্ষেত্রে ত্রি-ভাষার পুনঃ প্রবর্তন করার কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে উপজাতির ভাষাসহ শিশুটির মাতৃভাষা শিক্ষাদানের সবচেয়ে ভাল মাধ্যম বলে ভাবা হয়েছে। পড়তে ও লিখতে পারা বা শুনতে ও বলতে পারা পাঠ্যক্রমের সব দিকেই শিশুর উন্নতি ঘটায়। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে প্রত্যেকটি শিশু যাতে পড়তে পারে সেই বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া উচিত,কারণ এটাই স্কুল শিক্ষার একটা ভিত হিসাবে কাজ করবে।

অঙ্ক শিক্ষার বিষয়টা এমনই হওয়া উচিত যাতে একজন শিশু চিন্তা করে বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে পারবে, দুর্বোধ্য বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, সমস্যা তৈরী করে সমাধান করতে সক্ষম হবে, এই বৃহৎ পরিধির লক্ষ্যে অঙ্ক শেখানোটা যথেষ্ট প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ যা শিশুটির মনে থেকে যাবে। অঙ্কে ভাল করাটা প্রত্যেক শিশুর অধিকার।

সমাজবিজ্ঞানের পাঠ হবে প্রান্তিক গ্রুপগুলির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে NCF-এর এই সুপারিশকে দৃষ্টান্ত মূলক বলা চলে। গুরুত্বপূর্ণ (প্রাকৃতিক) বস্তুগুলির সাথে (যেমন-জল)সম্পর্ক গড়ে তোলা। এছাড়াও লিঙ্গ সাম্য এবং তপসিলি জাতি, উপজাতি এবং প্রান্তিক গোষ্ঠিগুলির প্রতি সংবেদনশীলতার বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানের সর্বস্তরে যেন স্থান পায়।

এছাড়া NCF আরও চারটে বিষয়কে পাঠ্যক্রমে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে - কাজ, শিল্প ও ঐতিহ্যপূর্ণ হাতের কাজ, স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা এবং শান্তি। কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু নতুন পদক্ষেপের কথা ভাবা হয়েছে, যা শুরু হবে প্রাথমিক পূর্ব স্তর থেকেই। কাজ জ্ঞানকে রূপান্তরিত করে অভিজ্ঞতায় এবং সৃষ্টি করে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের যেমন আত্মপ্রত্যয়, সৃজনশীলতা এবং সহযোগিতা। বড়দের জন্য জীবনশৈলী সম্পর্কিত পড়াশুনা যা স্কুলের বাইরের সম্পদ থেকে পাওয়া যাবে। NCF কাজের বিষয়টিকে মাথায় রেখে উক্ত বিষয়টিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। স্কুলের বাইরের সংস্থাগুলোর সরকারী আস্থাভাজন বা স্বীকৃত হওয়া দরকার যাতে তারা work bench তৈরী করতে পারে, যেখানে শিশুরা যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সম্পদের সাহায্যে হাতে কলমে কাজ শিখতে পারে। হাতের কাজের পরিকল্পনাটা এই জন্যই রাখা হয়েছে যাতে এলাকা চিহ্নিত করে স্থানীয় হাতের কাজ শিক্ষকের সাহায্যে কারিগরি শিক্ষাকে হাতের কাজের মাধ্যমে শিশুদের কাছে সহজে পৌছে দেওয়া যেতে পারে।

শিল্পকলাকে সমস্ত স্তরে একটি বিষয় হিসাবে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যার চারটি বড় ক্ষেত্র যেমন, গান, নাচ, ছবি আঁকা এবং নাটক। কলাশিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দেশমুলক নয় আলোচনামূলক পদ্ধতির উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য, ব্যক্তিগত সচেতনতা সম্পর্কে উন্নীত করা, তাছাড়াও নিজেকে নানানভাবে প্রকাশ এবং বিকশিত করতে পারার ক্ষমতা। এছাড়া ভারতের ঐতিহ্যময় শিল্প, তা অর্থনৈতিক দিক দিয়েই হোক বা কারুশিল্পের দিক দিয়ে, তার গুরুত্বকে স্কুল শিক্ষার অন্তর্গত করা দরকার।

স্কুলে শিশুর সাফল্য নির্ভর করে তার পুষ্টি এবং ভালভাবে পরিকল্পিত শরীর শিক্ষার কার্যকলাপের উপর। ফলে মিড-ডে মিলের প্রোগ্রামকে আরও শক্তিশালী করার জন্য স্কুলের সময় ও সম্পদ বাড়ানো দরকার। স্কুল পূর্ববর্তী স্তর থেকে আরও উচ্চ স্তর পর্যন্ত মেয়েদের পুষ্টি ও শরীর শিক্ষার দিকে ছেলেদের সমান নজর দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার দরকার।

শান্তিকে জাতীয় উন্নয়নের পূর্ববর্তী শর্ত মনে করা দরকার। শান্তির বিষয়টি আজকের দিনে সমাজের মানসিক অবস্থায় মূল্যবোধগত কাঠামোতে প্রচন্ড প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ বর্তমান পৃথিবীতে বিবাদ মেটানোর পথ হিসাবে হিংসা ও অসহিষ্ণুতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শান্তির শিক্ষা শিশুদের সামাজিকীকরণ করবে গণতন্ত্র ও ন্যায়ের সংস্কৃতির পথে যা কার্যত হবে যথাযথ কাজ এবং প্রত্যেক স্তরে বিচক্ষণতার সাথে এমনই বিষয় ঠিক করা হবে তার মধ্য দিয়ে। শান্তি শিক্ষা পাঠ্যক্রমের এমন একটা বিষয় যা শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যও বলা হয়েছে।

পদ্ধতিগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নথিটিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দানের মাধ্যমে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং একে হাতিয়ার করেই দায়বদ্ধতা বাড়বে আর মান উন্নয়ন হবে।পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত নানান ধরণের স্কুল-ভিত্তিক প্রকল্প পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সম্পর্কে শিশুদের জ্ঞান তৈরী করতে ও পরিবেশগত সম্পদ আরও ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও সৃষ্টি করতে সহায়ক হতে পারে।

সর্বশেষে, এই নথি স্কুলের সাথে পঞ্চায়েত, অন্যান্য সামাজিক গোষ্টি, এন জি ও এবং শিক্ষক সংগঠন গুলিকে একসাথে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে। নতুন অভিজ্ঞতা অবশ্যই মূল স্রোতে থাকাটা প্রয়োজন এবং সার্বজনীন মৌলিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে যে সচেতনতা গড়ে উঠেছে সেটাই রাষ্ট্র এবং শিশু সম্পর্কিত সব এজেন্সির যৌথ কর্মকাণ্ডের একটা বিস্তৃত বিষয় হতে পারে।

■■

msev` msKjb

শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আসবে এস.এস.কে ও এম.এস.কে

প্রায় পাঁচ বছর ধরে টানা-পোড়েনের পর অবশেষে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র (SSK) ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোকে (MSK) শিক্ষা দপ্তরের বোর্ডের অধীনে আনা হচ্ছে। এস এস কে গুলিকে আনা হবে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ এবং এমএসকেগুলিকে আনা হবে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের আওতায়। ভেঙে দেওয়া হবে এস.এস.কে এবং এম.এস.কে গুলির বর্তমান পরিচালন সমিতি। গড়া হবে নতুন কমিটি।শিক্ষা এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখাশোনার দায়িত্ব থাকবে বোর্ডের উপর, কিন্তু পরিচালনা এবং বেতন দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে পঞ্চায়েত দপ্তরেরই হাতে। বর্তমানে রাজ্যে রয়েছে প্রায় ১৬ হাজার এস.এস.কে এবং প্রায় ২ হাজার এম.এস.কে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বোর্ডের আওতায় আসায় নিশ্চিতভাবেই বেশ খানিকটা চাপ বাড়বে বোর্ডের ওপর।

বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে যে, পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর তাদের সম্মতি দিলেই এটি আগামী বিধানসভার অধিবেশনে পেশ হবে এবং তারপর রাজ্যপালের স্বাক্ষর এর জন্য পাঠান হবে। এস.এস.কে এবং এম.এস.কে-এর ছাত্র/ছাত্রীদের মূলস্রোতে আসতে হবে এবং শেষে তাদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে হবে। তবে শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে এম.এস.কে-এর ছাত্র/ছাত্রীদের নবম শ্রেণী ভর্তি হতে খুব অসুবিধা হবে। শিক্ষা দপ্তরের সচিব বিক্রম সেন বলেছেন যে এই বছর ক্লাস ফাইভে ভর্তি ১০% বেড়েছে। যেহেতু ভর্তির জন্য কোনও পরীক্ষা নেই তাই ভর্তির হার বেড়েছে।

তবে এস.এস. কে-এর ছাত্ররা এম.এস.কে-এর পরিবর্তে প্রথাগত স্কুলে ভর্তিকেই পছন্দ করছে।

তথ্যসূত্র- বাংলা দৈনিক এই সময়- ১৯।১।১৩ এবং ইংরাজী দৈনিক The Statesman-১৯।১।১৩

সম্পাদকের বক্তব্যঃ- বিভিন্ন গবেষণা ও স্টাডির মাধ্যমে দেখা গেছে যে SSK ও MSK শিক্ষা দপ্তরের প্রাথমিক স্কুলের থেকে ভালো চলছে। অবশ্যই গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা একই ছত্রছায়ায় হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন থাকে যে, সেটা আমলা তান্ত্রিক শিক্ষা দপ্তরের অধীনে হবে না সাংবিধানিক দৃষ্টিকোন অনুযায়ী স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রনে থাকবে।

বেসরকারি শিক্ষায় প্রতিবন্ধী সংরক্ষণ

সংবাদ সংকলনঃ রাজ্যের সমস্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসাগুলিতেও প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের জন্য তিন শতাংশ সংরক্ষণ রাখার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। শুধু তাই নয় , প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের জন্য সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলারও নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। বুধবারই একটি জনস্বার্থ মামলায় প্রধান বিচারপতি অরুন মিশ্র ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় আইন মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের জন্য তিন শতাংশ সংরক্ষণ রাখার নির্দেশ জারি করেছিল। শুক্রবার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবীতে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জনৈক নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সূত্রেই নয়া নির্দেশ ডিভিশন বেঞ্চের।

এইসময়, ১৯।০১।১৩

স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি বাধ্যতামূলক হলো

বর্তমানে স্কুল লেভেল ম্যানেজমেন্ট কমিটি প্রতিটি স্কুলে বাধ্যতামূলক হলো। ২০১২ সালের ১৬ মার্চ এর কলকাতা গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে শিক্ষা আইনের অন্তর্গত এই নোটিফিকেশন গ্রামাঞ্চলে এখনও যথাযোগ্য ভাবে পালিত হচ্ছে না বললেই চলে। অথচ এই নোটিফিকেশন যদি কার্যকর করা যেত তবে একথা বলা যেতেই পারে যে বর্তমানে শিক্ষা নিয়ে গ্রামাঞ্চলে যে ঢিলাঢালা ব্যবস্থা রয়েছে তার থেকে কিছুটা হলেও উন্নত হতো। তবে এর পাশাপাশি একথাও উলেখ্য যে, পঞ্চায়েতের অধীনস্ত গ্রামের SSK এবং MSK গুলির ভবিষ্যত এই বিষয়ে এখনও অনিশ্চিত।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা অধিকার আইনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নিয়মাবলীর সংক্ষিপ্ত রূপ

কেন্দ্রীয় শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর নিয়মানুসারে প্রতিটি রাজ্যেরই নিজ রাজ্যের জন্য নিয়মাবলী (রুলস) তৈরি করা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এই নিয়মাবলী অনুসারেই আইনটি রাজ্যে রূপায়িত হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি এই নিয়মাবলী গত ১৬ই মার্চ, ২০১২ কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই নিয়মাবলী আমরা সংক্ষেপে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি। শিক্ষা অধিকার আইন রূপায়ণে রাজ্য সরকার মোট যে ১৯টি ধারার নিয়ম তৈরি করেছে তা নিম্নরূপঃ

ধারা (১)ঃ সংক্ষিপ্ত নাম ও শুরুর তারিখ

ধারা (২)ঃ নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত ১৬ টি শব্দ ও শব্দবন্ধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এতে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল শ্রেণী অনুসারে শিশুর ভর্তির বয়স।

ধারা (৩)ঃ এতে আছে বিশেষ প্রশিক্ষণ, যার মধ্যে অন্যতম হল শিশুর বয়স অনুযায়ী কোনও শ্রেণীতে ভর্তির দুসপ্তাহের মধ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করবে তার বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা ও সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা (৪)ঃ অঞ্চল বা সীমা। এতে অন্যতম আলোচ্য স্কুলের দূরত্ব। রাজ্য সরকার প্রয়োজনে প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ম-৪র্থ) স্থাপন করবে গ্রামে ১ কিলোমিটারের মধ্যে ও শহরে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে, উচ্চ প্রাথমিক (৫ম-৮ম) গ্রামে ২ কিলোমিটারের মধ্যে ও শহরে ১ কিলোমিটারের মধ্যে। এছাড়া এই নিয়মটির মধ্যে আরও দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। (১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পড়ুয়ার সর্বোচ্চ সংখ্যা ৩০০ এবং উচ্চ প্রাথমিকের ক্ষেত্রে পড়ুয়ার সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে ৫০০ এবং (২) স্কুলছুট সম্পর্কে অবহিত হতে স্কুল শিক্ষা দপ্তর নিয়মিত পরিবার ও শিশু সমীক্ষা করবে।

ধারা (৫)ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শিশুদের তথ্য সংরক্ষণ, এতে তিনটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ (১) রাজ্য সরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সার্কেল লেভেল রিসোর্স সেন্টারে একটি রেজিস্টারে সংশিষ্ট অঞ্চলের শিশুদের জন্ম থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত তথ্য সংরক্ষণ করবে, (২) সাধারণ মানুষ এই রেজিস্টার দেখতে পারবে এবং (৩) স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি স্কুলে ভর্তি হওয়া শিশুদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জনসাধারণকে অবহিত করবে।

ধারা (৬)ঃ এতে আছে রাজ্য সরকার দুর্বলতর ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর পড়ুয়া শিশুদের জন্য খরচ প্রদান করবে।

ধারা (৭)ঃ এতে বলা আছে স্কুলে ভর্তির জন্য বয়সের প্রমান কীভাবে হবে।

ধারা (৮)ঃ এতে শিশুদের ভর্তির বর্ধিত সময় সম্পর্কে বলা আছে।

ধারা (৯)ঃ রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠন না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন অথরিটি হিসাবে কাজ করার জন্য রাইট টু এডুকেশন প্রোটেকশন অথরিটি কাজ করবে।(এটি বর্তমানে নিস্প্রয়োজন)

ধারা (১০)ঃ এতে আছে স্কুলের স্বীকৃতি সংক্রান্ত শংসাপত্র কীভাবে পাওয়া যাবে।

ধারা (১১)ঃ এতে আছে স্কুলের স্বীকৃতি প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়।

ধারা (১২)ঃ এতে আছে অনুমোদিত ও অ-অনুমোদিত সব স্কুল সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও সংশিষ্ট পর্ষদ কর্তৃক ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

ধারা (১৩)ঃ স্কুল পরিচালন কমিটি ও তার কার্যাবলীঃ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হলঃ

(১) প্রতি ৩ বছর অন্তর স্কুল পরিচালন কমিটি গঠিত হবে

(২) শিডিউল -৩ অনুসারে প্রাথমিক স্কুল পরিচালন কমিটি কমপক্ষে ১২ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে থাকবে

(ক) স্কুলটি যে এলাকায় অবস্থিত সেটি পঞ্চায়েত এলাকা হলে গ্রামসভার একজন নির্বাচিত সদস্য ও পৌরাঞ্চল হলে পৌরসভার নির্বাচিত কাউন্সিলর/কমিশনার; (খ) প্রধান শিক্ষক অথবা টিচার-ইন-চার্জ;

(গ) নিম্নলিখিত শ্রেণী ভিত্তিক অভিভাবক প্রতিনিধি ১০ জনঃ

১. ১ম শ্রেণী ২ জন সদস্য, ১ জন তপসিলি জাতি ও ১ জন সাধারণ

২. ২য় শ্রেণী ২ জন সদস্য, ১ জন তপসিলি উপজাতি ও ১ জন সাধারণ

৩. ৩য় শ্রেণী ৩ জন সদস্য, ১ জন ওবিসিএ, ১ জন তপসিলি উপজাতি ও ১ জন সাধারণ

৪. ৪র্থ শ্রেণী ৩ জন সদস্য, ১ জন ওবিসি-বি, ও ২ জন সাধারণ। বিশেষ তালিকাভুক্ত সদস্যের অভাব

Registered No. WB/SC - 320

No. WB/CPS/K-77 (Part I)/2012

The Kolkata Gazette

Extraordinary
Published by Authority

FALGUNA 26] FRIDAY MARCH 16, 2012 [SAKA 1933

PART I - Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

Government of West Bengal
School Education Department,
Law Branch

No.323-SE(Law)/ES/S/1A-01/2009. — 15th March, 2012. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Governor is pleased hereby to make the following rules, namely:

ঘটলে সাধারণ তালিকা থেকেই পূরণ করতে হবে। এছাড়া মোট সদস্যের ৫০ % হবেন মহিলা। এই কমিটি প্রতি দুমাসে একবার সভা করবে এবং সভার সিদ্ধান্ত রক্ষার ও তা জনসাধারণকে দেখাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। প্রধান শিক্ষক বা টিচার-ইন-চার্জ এই কমিটির আহ্বায়ক হবেন।

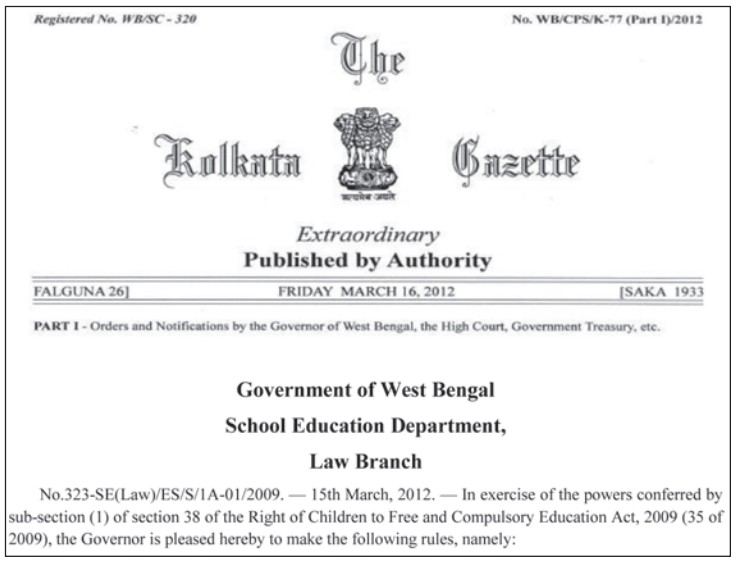

উচ্চ প্রাথমিক (৫ম-৮ম) ক্ষেত্রে স্কুল পরিচালন কমিটি গঠিত হবে Rules for Management of Recognised Non-Government Institutions (Aided and Unaided 1969), অনুসারে। এছাড়া এই নিয়মের মধ্যে আছে ভোটার তালিকা তৈরি, নির্বাচন, কমিটি গঠন ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক আরও নানা বিষয়।

ধারা (১৪)ঃ এতে আছে স্কুলের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতি। প্রতিটি স্কুলের পরিচালন কমিটি আইন অনুসারে যে শিক্ষাবর্ষে গঠিত হয়েছে সেই শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার ৩ মাস পূর্বে স্কুলের জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং প্রতি ৩ বছরে একবার করবে।

ধারা (১৫)ঃ এতে আছে শিক্ষকদের বেতন ও কাজের শর্ত।

ধারা (১৬)ঃ এতে আছে শিক্ষকদের কর্তব্য।

ধারা (১৭)ঃ এতে আছে শিক্ষকদের অভিযোগ নিস্পত্তি।

ধারা (১৮)ঃ এতে আছে কোনও শিশুর অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত হওয়ার পর তাকে প্রশংসাপত্র প্রদান।

ধারা (১৯)ঃ এতে আছে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত রাজ্য উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যদের ভাতা ও নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়।

(অতি সংক্ষেপে নিয়মাবলীটি প্রকাশ করা হল। উৎসাহী পাঠক আমাদের দপ্তরে যোগাযোগ করে মূল নথিটি দেখে নিতে পারেন।)

■■

নবদিশা

মহাত্মার ভাবনা
আমাদের সমকালের উত্তর

অন্যের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করাই হল নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়

সহ-নাগরিকের অপমানে মানুষ কীভাবে নিজে গর্বিত হয়, তা আমার কাছে সর্বদাই রহস্য

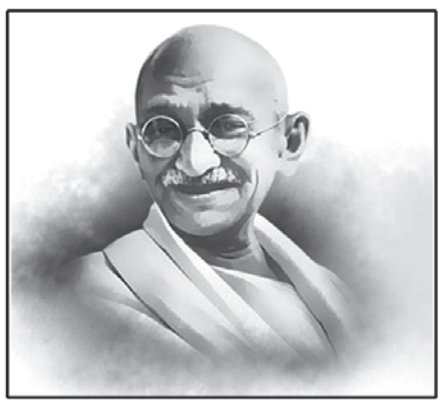

আমি শুধু মানুষের সদ্‌গুণগুলোই দেখি। আমিও তো নির্ভুল নই, তাই অন্যের ভুলভ্রান্তি বিচারের অধিকার আমার নেই

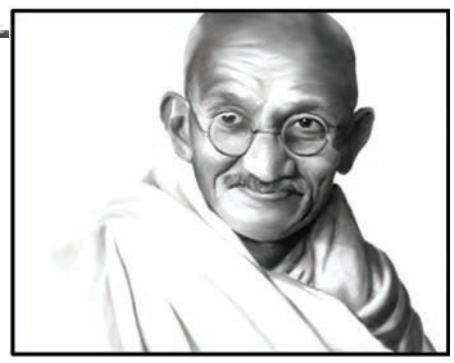

প্রার্থনায় অবনত হাজারখানেক মাথার থেকে একটিমাত্র কাজে কোনও এক আর্ত হৃদয়ের সেবা করা মহত্তর

এই বিশ্বে আমরা যদি প্রকৃত শান্তির পাঠ দিতে চাই আর যদি আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সত্যিকারের লড়াই করতে চাই, তাহলে আমাদের শিশুদের সঙ্গে থেকেই শুরু করতে হবে।

বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব রাখা খুবই সহজ। কিন্তু যে নিজেকে তোমার শত্রু মনে করে, তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সদ্ভাব রাখা প্রকৃত ধর্মের মূল আদর্শ। বাকি সবই নিছক বৈষয়িক কাজকর্ম

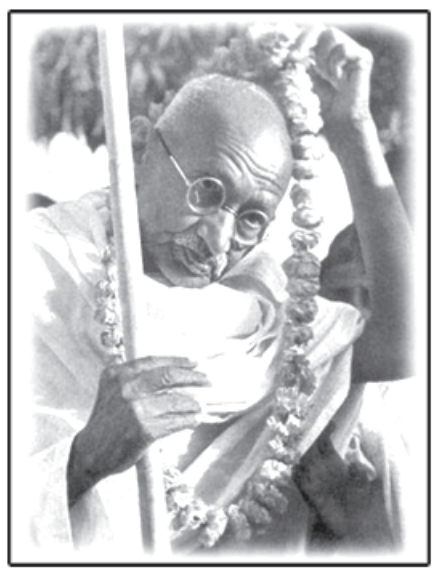

মানবতায় বিশ্বাস হারিয়ো না। মানবতা এক সমুদ্র। যদি তার মাত্র কয়েক ফোঁটা জল নোংরা হয়, তাহলে গোটা সমুদ্র দূষিত হয় না

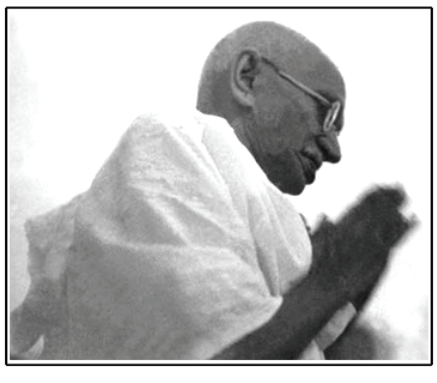

হৃদয়হীন কথা দিয়ে প্রার্থনা করার চেয়ে নিঃশব্দ হৃদয়ে প্রার্থনা করা ভালো

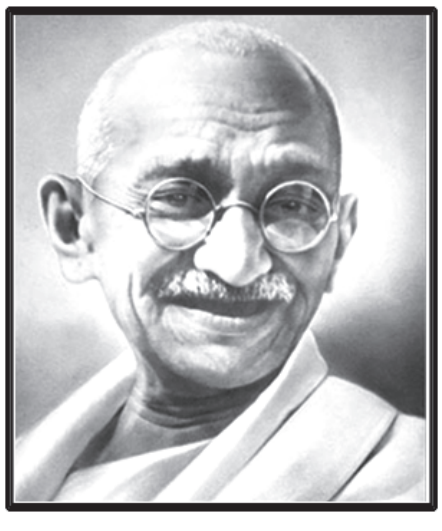

যা তুমি ভাবো, যা তুমি বলো আর যা তুমি করো তার মধ্যে সংহতি রাখাই হল সুখ

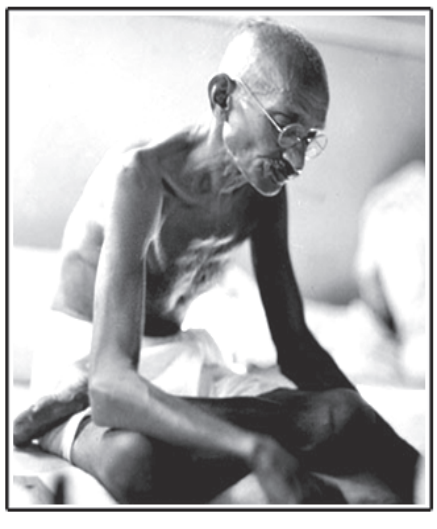

এই দুনিয়ায় মানুষের অভাব যথেষ্টই মেটানো যায়, কিন্তু মানুষের লোভ মেটানো যায় না

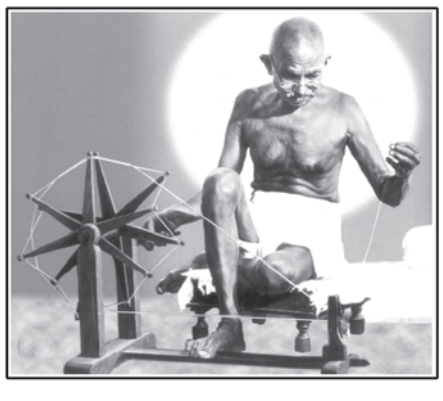

দুনিয়াকে পাল্টাতে চাইলে নিজেকে পাল্টাতে হবে

সম্পাদকের কথা ঃ- আশা করছি এই পাতাটি স্কুলের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো সম্ভব হবে এবং এক একটি বক্তব্য বাচ্চাদের কাছে বিশেষণ করে আলোচনা করার সুযোগ থাকবে। এইটি অডিও ভিসুয়াল (Video) আকারে পাওয়া যাবে। যোগাযোগ করুনঃ- নবদিশা দপ্তরে

GUvB

wK

wk¶v?

স্থানীয় জ্ঞানের ঐতিহ্য

ভারতবর্ষ বহু গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের এক বৈচিত্রময় পরিবেশ। এই দেশকে বৈচিত্রময় পরিবেশের জ্ঞানের ভান্ডার বলা চলে। গোষ্ঠীগুলি তার অঞ্চলের বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করে চলেছে বংশানুক্রমে এবং পরবর্তী বংশধরদের শিখিয়ে গেছে।ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। এই জ্ঞান যেসব বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলি হল-বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার স্থানীয় নামকরণ ও শ্রেণী বিভক্তিকরণ বা ফসল সংগ্রহ করা এবং অসময়ের জন্য গোলাজাত করা ও জলসংরক্ষণ অথবা সুস্থায়ী কৃষিকাজের অনুশীলন।এসব বিষয়ে স্কুলে পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী যে জ্ঞান দেওয়া হত কখনও কখনও স্থানীয় অঞ্চলের অভিজ্ঞতালবদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে তার তফাৎ হয়ে যায়।অন্য সময়ে অভিজ্ঞতালবদ্ধ জ্ঞানের তত গুরুত্ব থাকে না। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করতে পারেন স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা সাধারণের প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প তৈরী করার ক্ষেত্রে।এর মাধ্যমে ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও স্কুলের দেওয়া জ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয় করা যাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন গাছের প্রজাতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেখা যাবে দুধরনের জ্ঞানই গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে সমান্তরাল অবস্থায় রয়েছে। আবার অন্য ক্ষেত্রে, যেমন গাছের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে,স্থানীয় বিশ্বাসের সাথে বিবাদ দেখা দিতে পারে। যাইহোক,সকল ধরনের স্থানীয় লব্ধ জ্ঞানকেই সাংবিধানিক রীতিনীতি মেনে গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত।

তথ্যসূত্রঃ NCF ২০০৫

শিক্ষা যৌথ উদ্যোগঃ অ-সরকারি, নাগরিক ও শিক্ষক সংগঠনগুলির ভূমিকা

গত দশকের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল অ-সরকারি (NGOs)ও নাগরিক সংগঠনগুলির (civil society groups) সাথে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক গড়ে ওঠা। নতুন ধরনের মডেল স্কুল তৈরি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যবই ও পাঠ্যক্রমে ব্যবহার্য্য জিনিসপত্রের উন্নতিসাধন, সাধারণ মানুষজনকে সম্মিলিত করা এবং অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রে অ-সরকারি সংগঠনগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্কুল ও সম্পদকেন্দ্রগুলির সাথে তাদের এই নিয়মমাফিক যোগদান পাঠ্যক্রমের উন্নয়নে, অ্যাকাডেমিক (academic) সাহায্যের ক্ষেত্রে এবং গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। নাগরিক সংগঠনগুলিও শিক্ষাকে জনসমক্ষে নিয়ে আসতে ও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করেছে। NCF-এর প্রেক্ষাপটে তার ভাবনাগুলিকে প্রচার করা, স্কুল ও কম্যুনিটির মধ্যে সেগুলিকে সৃজনশীল আকারে অনুশীলন করানো, পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া জানানো এবং শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে গড়ে ওঠা প্রতিশ্রুতির পরিবেশকে লালনপালন এসবেই নাগরিক সংগঠনগুলির সহযোগিতা ও লেগে থাকাটা প্রয়োজন। শিক্ষক সংগঠনগুলিও স্কুল শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে আগের তুলনায় আরও বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তারা নিয়ম তৈরি করে তাদের সদস্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে যাতে স্কুলের নির্দিষ্ট সময় যথার্থভাবেই পড়াশুনার জন্য ব্যয় হয় এবং একটি দায়বদ্ধতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতেও সাহায্য করে। পাঠ্যক্রমের সফল প্রয়োগে যা কিছু সাহায্য প্রয়োজন তারা সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণও করতে পারে এবং একটি গঠনমূলক প্রেসার গ্রুপ হিসাবে কাজ করতে পারে স্কুলের সম্পদ, শিক্ষক-শিক্ষণের মান উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে।

তথ্যসূত্রঃ NCF ২০০৫

স্কুল স্থানীয় সম্পদকর্মীদের ব্যবহার করতে পারে

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে, বাবা-মা এবং শিক্ষকদের স্কুল শিক্ষার উন্নয়নের স্তরে আঞ্চলিক ঐতিহ্যগত শিল্পকলা ব্যবহারের উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন। আমাদের উচিৎ আমাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে রক্ষা করা এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যকে এক হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচান। শিশুদেরও তাদের চারপাশের অবস্থা এবং পরিবেশের বিশেষত্ব এবং বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সচেতন করা দরকার। সমস্ত স্কুলগুলির উচিৎ তাদের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলঘরের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে স্থানীয় এলাকার জন্য কিছু কাজ করার সুযোগ দেওয়া। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত শহর, মফস্বল এবং গ্রামাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব শিল্পকলা এবং স্থাপত্য আছে যাকে ঘিরে শিশুরা নিজেরাই এলাকার ইতিহাস তৈরী করতে পারে। স্থানীয় শিল্পী, কারিগর বা অভিনেতাদের স্কুলে ডাকা যেতে পারে বা তাদের অল্প সময়ের জন্য নিয়োগও করা যেতে পারে বিভিন্ন শিল্পকলা শেখানোর জন্য। স্কুলগুলির শিক্ষকদের উচিৎ তাদের ছাত্র/ছাত্রীদের একটা ছোট্ট লাইব্রেরী অথবা পোষ্টার, বই, চার্ট বা বিভিন্ন অডিও-ভিসুয়াল উপকরণের সংগ্রহশালা তৈরী করতে সাহায্য করা যা ছাত্র/ছাত্রীরাই ব্যবহার করবে এবং যত্ন করবে। শিক্ষকরা ছাত্র/ছাত্রীদের সাহায্যে আকর্ষণীয়ভাবে সাজানোর উপকরণ তৈরী করতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ National Council of Educational Research and Training

ভূরশু জাতীয় শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি বকের সেরেংডি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি পিছিয়ে পড়া গ্রাম ভূরশু, যার বেশির ভাগ মানুষ শ্রমজীবি। গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ জীবন জীবিকার জন্য ইট ভাটার কাজে বাহিরে চলে যান। তবে বর্তমানে ভূরশু গ্রাম আর পিছিয়ে নেই, এখানে অন্যান্য স্কুলের সাথে এলাকার প্রয়োজনেই একটি শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে গত ২০০৭ সালে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে নেওয়া জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাতে ২০০৭ সালে জেলা শ্রম দফতর ও জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মোট ৯০টি শিশু শ্রমিক প্রকল্প গড়ে ওঠে। তার মধ্যে সেরেংডি অঞ্চলের মধ্যে ভূরশু জাতীয় শিশু শ্রমিক বিদ্যালয় ২০০৭ সালে চালু হয়। ভূরশু ও কুশলডি গ্রামে যে সমস্ত শিশু শ্রমিক ছেলে ও মেয়ে ৮ থেকে ১৪ বছরের, তাদের নিয়ে এই বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন আরম্ভ করা হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক দিয়ে। ভূরশু গ্রামের দীপালি কুমার, পিতার নাম শ্রীশক্তিপদ কুমার, মাতা শ্রীমতি সারথী কুমার। দীপালি কুমারের বাবা-মা দিনমজুর প্রতিদিন অপরের বাড়িতে কাজ করেন কোনও রকম ভাবে সংসার চলে। দীপালিরা দুই ভাই বোন। দীপালি বাড়ির কাজ করে ও ছাগল চরায়, ভাই বাড়ির অভাবের তাড়নায় রামগড়ে কোনও এক হোটেলে কাজ করে। এই ভাবে দিন কাটে।

২০০৮ সালে শিশু শ্রমিক-এর বিষয়ে গ্রামে একটি সার্ভে করা হয়। এই সময় দীপালি কুমারকে ভূরশু জাতীয় শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে তারপর দীপালি বাড়িতে গরু-ছাগল চরায় ও স্কুলে পড়া শুরু করে। এইভাবে পড়তে পড়তে দীপালির মামার বাড়ির মামা ও দাদু দিদারা দীপালির বিবাহ ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেন। কোনক্রমে দীপালি তার বিবাহর কথা জানতে পেরে প্রথমে তার বন্ধু বীনা কালিন্দীকে ও তার সহপাঠীদের বিষয়টি জানায়। তারপর বীনা কালিন্দী ও আরও কয়েকজন বান্ধবী মিলে দীপালির বাবাকে বীনা প্রশ্ন করে দীপালিকে তোমরা বিবাহ দিচ্ছ নাকি? দীপালির বাবা-মা বললেন হ্যাঁ বিবাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত দীপালির মামা বাড়ির মামাও দাদু দিদারা ঠিক করেছেন, আমরা তা জানিনা। তবে বিবাহ দেওয়ার জন্য সমস্ত জিনিস কেনাকিনি করে ফেলেছেন এবং বিবাহর দিন পর্যন্ত ঠিক করে ফেলেছেন। বীনা কালিন্দী বলেন আমার বাবা-মা আমার জন্য বিবাহ ঠিক করেন, আমি কিন্তু সেই বিবাহ বন্ধ করে দি। তাই আমি বলছি দীপালিকে আপনারা বিবাহ দেবেন না। দীপালির এখন বিবাহর বয়স হয়নি তাকে এখন পড়াশুনা করতে দাও নিজের পায়ে দাড়াতে দাও তারপর বিবাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবেন। দীপালির বাবা-মা কিছুতে বুঝতে রাজি হননি। স্কুলে শিক্ষক মহাশয়ের সাথে আলোচনা করে ও দীপালির বাবাকে জেলা শ্রমদফতরে মাননীয় প্রসেনজিৎ কুণ্ডুর সাথে আলোচনা করে দীপালির বাবাকে অনেক বুঝিয়ে দীপালির বিবাহ বন্ধ করা হয়।

দীপালি কুমার ২০১০ সালে ভূরশু জাতীয় শিশু শ্রমিক বিদ্যালয় থেকে ৪র্থ শ্রেনীতে পড়া শেষ করে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য LITERACY INDIA নামে একটি সংস্থার দ্বারা দীপালি কুমারকে ২০১০ সালে Barabarar Girls' High School (K.G.B.V.) ও Hostel - এ পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হয়। দীপালি কুমার এখন ৮ম শ্রেণীতে পড়ছে। দীপালি কুমার বাল্যবিবাহের প্রতিবাদ করে গ্রামের তথা বাঘমুণ্ডি বকের এবং সমাজেও একটি নজীর সৃষ্টি করে। তার ফলে বর্তমানে এলাকার ও গ্রামের বাল্যবিবাহ প্রায় অনেকটা কমে গেছে।

আশা করি আগামী দিনে ভূরশু জাতীয় শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী দীপালি কুমার-এর মতো শিশু শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারে এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী শিশুরা যেন নিরাপদে এবং মর্যাদা সহকারে সুরক্ষাদায়ক ও বিকাশ সহায়ক পরিবেশে বাঁচতে পারে। তার জন্য আমরা নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাব।

পরীক্ষিৎ কুমার,
(প্রধান শিক্ষক, ভুরশু
জাতীয় শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়)

তারিখঃ ০৬.০৪.২০১৩

আপনাদের ব্যবহারের জন্য

বর্তমানে শিক্ষা বিষয়টি দুর্ভাগ্যক্রমে শুধুমাত্র স্কুল চৌহদ্দি এবং পাঠ্যপুস্তকে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে, প্রয়োজনীয় বিদ্যাভাসের পাশাপাশি ছোটদের মানসিক বিকাশ, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য যে নানাবিধ শিক্ষার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে অনেকেই কমবেশি ওয়াকিবহাল হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ খুব একটা চোখে পড়ে না। স্কুলে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকা বাচ্চাদের জন্য পাঠক্রমের বাইরে কিছু খেলাধুলা-সাংস্কৃতিক কম-র্কাণ্ডের জন্য নির্দেশিকা থাকলেও, এ বিষয়ে শিক্ষকদের অনভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সঠিক দিশার অভাবে এই কর্মকাণ্ডগুলি বেশিরভাগ স্কুলে চালু নেই। কোথাও কোথাও থাকলেও ধারাবাহিকতার অভাবে সেভাবে এই কর্মকাণ্ডগুলি ফলপ্রসূ হয় না। গ্রামীণ স্কুলগুলির ক্ষেত্রে এই অভিযোগ আরো বেশি করে সত্যি। এই পরিস্থিতিতে পাঠবহির্ভুত শিক্ষার দায়দায়িত্ব কে বা কারা নেবেন, কীভাবে তা কার্যকর করা হবে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা বিতর্ক চালু থাকলেও বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার কাজটি করতে যখন কেউ এগিয়ে আসছেন না, তখন স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষার শিক্ষা পদ্ধতি ও উপকরণ নিয়ে নবদিশার উদ্যোগ শরীরটাকে দূর্গ গড়ি, খুব বিশেষভাবে উলেখ করার মত একটি ঘটনা।

শরীরটাকে দুর্গ গড়ি ডিভিডি-টি গ্রামীণ পরিবেশ পরিস্থিতি মাথায় রেখে গল্পের ছলে কমবয়সী ছেলে মেয়েদের জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার প্রাথমিক কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় তুলে ধরেছে। স্বাস্থ্যের মত আপাত নীরস বিষয় নিয়ে বানানো গল্প-ছবি কোথাও তথ্য বা জ্ঞানের দাপটে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। ব্যক্তিগতভাবে ছোটদের নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নিজেদের আশেপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে ছবিটি সহায়ক হবে। নিছক উপদেশ না দিয়ে শিশুমনে শরীর ও অসুস্থতার কার্যকারণগুলি যেভাবে গল্পের ছলে গেথে দেওয়া আছে তা ছোটদের স্বাস্থ্য-শরীর-অসুখ ইত্যাদি বিষয়ে আরো কৌতূহলি করে তুলবে বলে মনে হয়। শিশুদের জন্য শুধু গল্প-ছবি নয় পাশাপাশি শিক্ষক বা যাদের তত্ত্বাবধানে শরীরটাকে দুর্গ গড়ি তথ্যচিত্র ছোটদের দেখানো হবে, তাদের জন্য যে নির্দেশিকাটি আছে সেটিতেও অত্যন্তপ্রাঞ্জল ভাবে করা হয়েছে শিক্ষক বা সঞ্চালক যিনি থাকবেন তার ভূমিকা। আলাদা করে একটি তথ্য পুস্তিকা সঙ্গে আছে আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছুটা বিশদ জ্ঞানের জন্য। টেলিভিসনমুখি বর্তমান সময়কে মাথায় রেখে ছোটদের জন্য অ্যানিমেশন ধর্মী এই চিত্রায়ন সামগ্রিক পরিকল্পনা ও রূপায়নের জন্য মারফৎ সংস্থা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

আপনারা যদি টেলিভিশনের ব্যবস্থা করতে পারেন তবে এই শিক্ষনিয় অডিও ভিসুয়ালটা ব্যবহার করতে পারবেন। এটি পেতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করবেনঃ- ৫/১/২/জি কর্নফিল্ড রোড, কলিকাতাঃ- ৭০০০১৯ ফোনঃ- ৬৫২২১০৯৭

প্রথম পাতার পর .....

উইলিয়াম অ্যাডামস-এর চোখে

পরিবেশিত তথ্যে দেখা গেছে স্কুলগুলি ছিল এক-শিক্ষক বিশিষ্ট। তিনি জাত-ভিত্তিক ৬৬ জন হিন্দু শিক্ষকের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে ব্রাহ্মন থেকে চন্ডাল মোট ১০টি জাতের লোক ছিল। সংখ্যায় সবথেকে বেশি ছিল কায়স্থরা, ৩৯ জন। একটি বাংলা স্কুলে তিনি মুসলিম শিক্ষক দেখেছিলেন। অ্যাডাম্স্ বলেছেন, পড়তে, লিখতে ও অংক কষা শেখাতে কায়স্থরা ভালো পারে বলে মনে করা হত। অ্যাডাম্স্ আরো একটি চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন, সমাজের উচ্চবর্গের মানুষজন তাদের শিশুদের নিম্নবর্গের বা এমনকী অন্য ধর্মের শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত স্কুলে পাঠাতে দ্বিধা করতেন না। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন, উপরে উলিখিত মুসলিম শিক্ষকের স্কুলে ভালো সংখ্যক হিন্দু ছাত্র ছিল। চন্ডাল বা অন্য নিম্নবর্গের শিক্ষকদের স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে।

শিক্ষকদের মধ্যে নানা পেশারই লোক ছিল। তিনি চারজন শিক্ষককে চিহ্নিত করেছিলেন যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করতেন। এঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন পারিবারিক পুরোহিত, একজন তাঁতী ও একজন খুচরো ব্যবসায়ী। একজন পুরোহিত সম্পর্কে অ্যাডাম্স্ বলেছেন, তিনি অভিভাবকদের কাছ থেকে মাসিক কোনও নির্দিষ্ট মাহিনা নিতেন না, তবে দুর্গা পূজার সময় উপহার হিসাবে চাল, ডাল, তেল, শাকসবজী ও রান্নার বাসন প্রভৃতি নিতেন। তাঁতী-শিক্ষকটিরও নির্দিষ্ট কোনও পারিশ্রমিক ছিল না, ছাত্ররা যা দিত তাই নিতেন। অ্যাডাম্স্ এমন শিক্ষকেরও সন্ধান পেয়েছিলেন যাঁরা মাহিনা নিতেন, কিন্তু ছাত্রদের অনেককেই বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন এবং এই ঘটনা তাঁকে বেশ মোহিত করেছিল। তিনি লিখেছেন, স্থানীয় সমাজের সবথেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে এইসব অকৃত্রিম পরোপকারের ইচ্ছার ঘটনাগুলি উলেখ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দ বোধ করছি।

জেলার বেশীরভাগ শিক্ষক তাঁদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক পেতেন বিভিন্নভাবে। কয়েকজন মাসিক মাহিনা পেতেন যা (সমাজের) কোনও একজন (বিশিষ্ট) ব্যক্তি দিয়ে দিতেন; অন্যেরা প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে মাসিক ভাতা পেতেন যার পরিমাণ ছিল এক আনা থেকে আট আনা; এবং অন্যেরা, যাদের মধ্যে কেউ মাহিনা বা ভাতা পেতেন আর কেউবা পেতেন না, উপরি (খারাপ অর্থে নয়) হিসাবে পেতেন চাল, ছাত্ররা যে যেমন দিতে পারত, খোরাকী হিসাবে পেতেন মাসে প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে দু-তিন আনা বা সকলের মিলিয়ে দু-তিন টাকা, কেউ কেউ দুর্গা পূজার সময় পার্বণী হিসাবে পেতেন টাকা অথবা কাপড়চোপড় যার মূল্য সব ছাত্রদের কাছ থেকে মিলিয়ে বছরে আট আনা থেকে চার-পাঁচ টাকার মধ্যে থাকত। অ্যাডাম্স্ তাঁর রিপোর্টে বাংলা ও হিন্দি স্কুলের ৬২ জন শিক্ষকের মোট মাসিক মাহিনার যে হিসাব দিয়েছিলেন সেই অনুসারে গড়ে প্রতি শিক্ষকের মাসিক মাহিনা ছিল চার টাকার মত।

এরপর অ্যাডাম্স্ স্কুলবাড়ি নির্মাণ সম্পর্কে রিপোর্টে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, কখনও কখনও স্কুলবাড়ি শিক্ষকমশায় নিজেই তৈরী করে নিতেন; কখনও কখনও অঞ্চলের তুলনামূলকভাবে সচ্ছল ব্যক্তি স্কুলবাড়ি তৈরীর খরচ দিতেন, যাঁর ছেলে ওই স্কুলে পড়ত; কখনও কখনও সর্বসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে স্কুলবাড়ি তৈরী হত। - শিক্ষক ও অভিভাবকরা কিছু অর্থ দিতেন, ছাত্ররা স্কুলবাড়ি নির্মাণে গায়েগতরে খাটত, পরোপকারী কোনও ব্যক্তি হয়ত জমি দান করতেন, তার সাথে অর্থ ও বাড়ি তৈরীর মালমশলাও দিতেন। তবে অ্যাডাম্স এও জানিয়েছেন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি স্কুলের নিজস্ব বাড়ি দেখেন নি। সেসব ক্ষেত্রে স্কুল বসত কোন শিক্ষক বা কোনও পরিবারে বাড়িতে, বা কোনও মন্দিরের দাওয়ায়, বা কোনও দোকানঘরের কোনে, বা মসজিদের চাতালে, অথবা কোনও গাছতলায়।

বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে মোট ৬৭টি স্কুলে মোট ছাত্র ছিল ১০৮০ জন, অর্থাৎ স্কুলপ্রতি গড়ে ১৬.১ জন। সমীক্ষা চলাকালে তাদের গড় বয়স ছিল ১০.১ বছর। ৭৭৮ জন ছাত্রের স্কুলে ঢোকার সময় গড় বয়স হিসাব করা হয়েছিল ৬.০৩; আর স্কুল ছাড়বার আনুমানিক বয়স হিসাব করা হয়েছিল ১৬.৫ বছর। এই হিসাব থেকে স্পষ্ট ছাত্ররা প্রায় ১০ বছর স্কুলে কাটাত। হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ব্রাহ্মন ও কায়স্থ। তবে ছাত্রদের মধ্যে নিম্নবর্গের শিশুরাও সংখ্যায় খুব কম ছিল না। হিন্দু ছাত্রদের জাত বিভাজনের ক্ষেত্রে অ্যাডাম্স্ মোট ৫০টি জাতের উলেখ করেছেন, যার মধ্যে ব্রাহ্মন থেকে চন্ডাল সকলেই ছিল। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য শিক্ষার জগতে নিম্নবর্গের মানুষের জাগরণ ঘটেছে। সংস্কারের বেড়া টপকেএই নিঃশব্দ আন্দোলন গড়ে ওঠার জন্য অ্যাডাম্স্ অবশ্য শক্তপোক্ত বৃটিশ শাসনকেই বাহবা দিয়েছেন।

> হিন্দু ছাত্রদের জাত বিভাজনের ক্ষেত্রে অ্যাডাম্স্ মোট ৫০টি জাতের উলেখ করেছেন, যার মধ্যে ব্রাহ্মন থেকে চন্ডাল সকলেই ছিল। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য শিক্ষার জগতে নিম্নবর্গের মানুষের জাগরণ ঘটেছে।

কীভাবে লেখার অভ্যাস চলত তা নিয়ে অ্যাডাম্স্ লিখেছেনঃ লেখার ক্ষেত্রে চারটি ধাপ ছিল, প্রথম ধাপে ছাত্ররা মাটিতেই লেখা অভ্যাস করত, দ্বিতীয় ধাপে লেখার জন্য তালপাতা ও কাঠের বোর্ড ব্যবহার করা হত, তৃতীয় ধাপে পিতলের পাত ও একধরনের গাছের চ্যাটালো পাতা এবং চতুর্থ ধাপে কাগজ। লিখত চক ও নলখাগড়ার কলম দিয়ে।

সবশেষে, স্কুলের পঠনপাঠন নিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে। ৪টি হিন্দি স্কুলে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক হিসাবনিকাশ, ১৪টি বাংলা স্কুলে কেবলমাত্র কৃষিকাজের হিসাব এবং ১০টি বাংলা স্কুলে বাণিজ্যিক ও কৃষি বিষয়ক হিসাব দুই-ই শেখানো হত; ৩টি স্কুলে, যার মধ্যে ১টি হিন্দি ও ২টি বাংলা। লেখার কাজ মূলত মাতৃভাষায় লেখানো ছাড়া বাণিজ্যিক ও কৃষি বিষয়ক হিসাব দুই-ই শেখানো হত। একমাত্র হিন্দি স্কুলটিতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা নিয়ে লেখাপড়া হত। এই তথ্য থেকে একটা কথা স্পষ্ট সেসময় শিশুদের পড়াবার মত হিন্দিতে ভালো কোন বই ছিল না। একটিমাত্র বাংলা স্কুলে "গুরু বন্দনা" শেখানো হত। এতে কোনও ছন্দ ছিলনা। ৩২টি স্কুলে শুভঙ্করি নিয়মে অঙ্ক শেখানো হত। ৩টি স্কুলে ছন্দের বালাইহীন "গুরু দক্ষিণা" শেখানো হত যা গেয়ে বয়স্ক ছাত্ররা শিক্ষকদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করত। একটা বাংলা স্কুলে মাতৃভাষার সাথে সাথে সামান্য সংস্কৃতও শেখানো হত। ১৪টি স্কুলে সংস্কৃতে চাণক্য শোকও পড়ানো হত। এইসব স্কুলে মাতৃভাষা বা সংস্কৃত যা পড়ানো হত তা পান্ডুলিপি দেখে বা শিক্ষকদের স্মৃতি থেকে পড়ানো হত; কিন্তু ৫টি স্কুলে ছাপানো "শিশু বোধ" পড়ানো হত যার মধ্যে উপরে উলিখিত শুভঙ্করী নিয়ম, চানক্য শোক ও গুরুদক্ষিণা ছিল। তবে মনে রাখতে হবে বাংলায় তখন ছাপাখানার প্রথম যুগ, তাই স্বাভাবিকভাবেই ছাপার মান ভালো ছিল না। অ্যাডাম্স্ দুজন শিক্ষকের কথা উলেখ করেছেন যাঁদের কাছে তিনি সেই সময়কার ছাপানো স্কুলপাঠ্য বই দেখেছিলেন।

(চলবে)

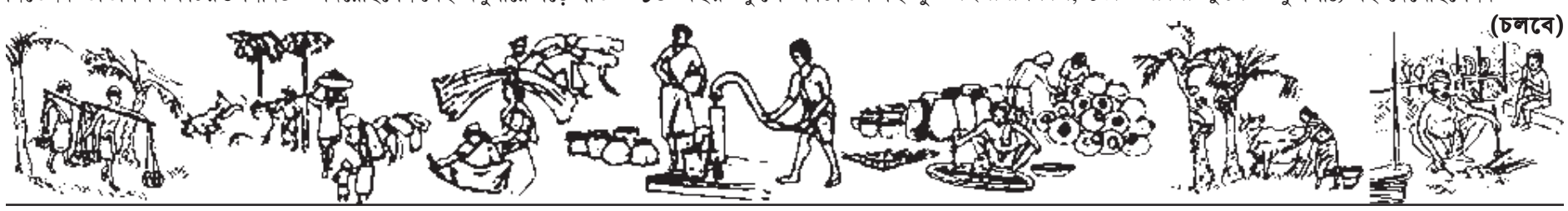

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/জি কর্ণফিল্ড রোড, কলিকাতা -৭০০০১৯ হইতে প্রকাশিত ও শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY